স্মরণিকা

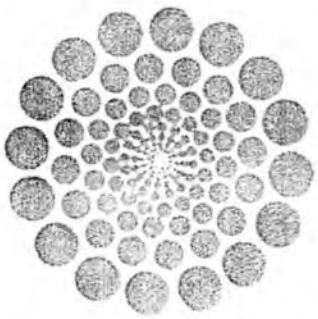

মুদিয়ালী লাইব্রেরী শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

১৮৭৬-১৯৭৬

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : মেটিয়াবুর্জ

সুলতান আহ্মেদ

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের দক্ষিনে অবস্থিত ও উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে বস্ত্রবিপণিবেষ্টিত সিবতেন আবাদ ইমামবাড়ী নিত্যই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং এর সুউন্নত প্রশস্ত প্রবেশদ্বার যেন এক অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য ঘোষনায় গর্বিত ও উন্নতশির। উক্ত ইমামবাড়ী বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে লেখককে ইতিহাসের এক অবহেলিত অধ্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়। উপাদানের একান্ত অভাব ; সঠিক সত্য পাওয়া দুরূহ এবং লোকমুখে প্রচলিত বহু কাহিনী ও কিংবদন্তী দ্বারা প্রকৃত সত্য সমাচ্ছন্ন। তাছাড়া প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও পাণ্ডুলিপি যা কিছু ইমামবাড়ী কর্তৃপক্ষের হস্তবুদ ছিল তা সবই তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেল যে স্থানীয় ইতিহাস কক্ষচ্যুত হয়ে জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়ে নিয়েছে আশ্রয়। ফলে এর গুরুত্ব পেয়েছে আরও বৃদ্ধি। উক্ত ইমামবাড়ী দেখে অসংখ্য প্রশ্ন উদিত হয় আমাদের মনে। কে বা কারা, কখন, কি কারনে বা কোন্ লক্ষ্যের দিক তাকিয়ে এর প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সর্বাগ্রে জানতে হবে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে যার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায়, মার্জিত রুচিবোধে ও সুদক্ষ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে এই মেটিয়াব্রুজ একদা পরিনত হয়েছিল, বাগ-বাগিচা, কুসুম-কুঞ্জে শোভিত এক ক্ষুদ্র শহরে। অযোধ্যার সীজার-রূপী এই নবাব তাঁর জন্মভূমি, রাজ্য, স্বজন-প্রিয়জন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সকল আয়োজন ও দ্রব্যসম্ভার এবং সবার উপর তাঁর সাধের কায়সারবাগ পরিত্যাগ করে কখন এবং কেনইবা ভাগীরথীর তীরে বাংলার মাটিতে এই মেটিয়াব্রুজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইমামবাড়ীর ইতিহাস এবং নবাব ওয়াজেদের ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওয়াজেদকে বাদ দিয়ে ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থাকবে অসম্পূর্ণই। সুতরাং জানতে হবে তাঁর কলকাতা আগমনের ঐতিহাসিক পটভূমি ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

ওয়াজেদের পিতা আমজাদ আলী শাহ নাবিনা (অন্ধ) ছিলেন ইউপির অন্তর্গত অযোধ্যার চতুর্থ নবাব। বংশানুক্রমে তাঁরা ছিলেন উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত। রাজধানী ছিল লক্ষ্ণৌ। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাণী কিশ্ওরের গর্ভে ওয়াজেদের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর ওয়াজেদ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব পদে অভিষিক্ত হন। দিল্লীর সম্রাট

বাহাদুর শাহের পতনের পর স্থানীয় নবাবগণ স্বাধীনতা ঘোষনা করলে ইংরেজদের সঙ্গে বাধল বিরোধ। ইংরেজগণ শাসক হিসাবে নবাবদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখলেন এবং রাজ্যশাসনে অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমম কতকগুলি কঠোর বিধি নিষেধ ও সর্তাদি আরোপ করলেন যা নবাবদের মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। ফলে তাদের মধ্যে ধূমায়িত হল প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। শাসন ব্যাপারে নবাবের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই ছিল না। বৃটিশ রেসিডেন্টের মতামত ভিন্ন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই ছিল না। ওয়াজেদের অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রথমে লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩১ খৃঃ) ও পরে লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৭ খৃঃ) অযোধ্যার নবাবের উপর নূতন সর্তাদি আরোপ করে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে ইংরেজ সরকারের হস্তে রাজ্য অর্পন করতে এবং নবাবকে মহীশূরের নবাবের মত কেবল বৃত্তিভোগী হয়ে থাকতে হবে। ১৮৪৭ খৃঃ ওয়াজেদের সিংহাসন লাভের পর লর্ড হার্ডিঞ্জ উক্ত সাবধানবাণীর পুনরাবৃত্তি করেন। ওয়াজেদ গেলেন ইংল্যাণ্ড রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট নালিশ করতে কিন্তু তাঁর স্বদেশে ফেরার পর উক্ত নালিশের ফলাফল কিছু জানা না গেলেও সহজেই অনুমেয়।

লখ্‌নৌ থেকে কলকাতা—

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ, সিপাহী বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব। লক্ষ্ণৌ-এর তৎকালীন বৃটিশ রেসিডেন্ট ছিলেন প্রথমে স্লীম্যান ও পরে জেম্‌স আউটরাম। অযোধ্যায় বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল নবাব পরিবার। দেশের প্রজাসাধারণ, হিন্দু-মুসলমান, জমিদার ধনী নির্ধন সকলেই বৃটিশ বিরোধী মনোভাবে উত্তেজিত, উন্মত্ত ও ক্ষিপ্ত ইংরেজদের এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে দেশের প্রজা ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ও উষ্মার পশ্চাতে রয়েছে বিশেষরূপে ওয়াজেদের প্ররোচনা, উস্কানি ও ইন্ধন। তাছাড়া বৃটিশ রেসিডেন্ট পূর্ব হতেই ওয়াজেদের উপর ছিলেন অসন্তুষ্ট। নবাবের ইঙ্গিতে আসন্ন এক ভয়াবহ বিদ্রোহের ভয়ে তাঁরা ছিলেন ভীত। অযোধ্যার শাসন বিষয়ে শোচনীয় অবস্থা ও অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে ওয়াজেদের বিরুদ্ধে তিনি লর্ড ডালহৌসীর নিকট এক রিপোর্ট পেশ করলেন। ডালহৌসী ওয়াজেদকে নাম সর্ব্বস্ব নবাব রেখে বৃটিশ সরকার অযোধ্যার শাসনকার্য্য পরিচালনা করবেন বলে ঘোষনা করলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডায়রেক্টর্স্ ছিলেন অযোধ্যাকে সরাসরি বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করে (annexation) নেওয়ার পক্ষপাতী। সুতরাং ১৮৫৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজগণ অযোধ্যা অধিকার করে নিলেন। ওয়াজেদকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। অন্তরীণ করা হল ফোর্ট উইলিয়মে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র আটজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। কারও সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যদিও নবাব পরিবার ও

প্রিয়জন তখনও ছিল অযোধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়মে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাস অন্তরীণ কালে যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ক্লেশ তাঁকে ভোগ করতে হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্বরচিত "সাকীনামা" নামক এক দীর্ঘ কবিতায়। স্বাধীনতাপ্রিয় কবি ওয়াজেদের মন মুক্তপ্রকৃতির একটু আলোবাতাসের জন্য উচাটন হয়ে বন্দীদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করত এবং কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করলে তাঁকে উক্ত ফোর্টের টাওয়ারের নিকট উচ্চমৃত্তিকা স্তূপের উপর হতে দেখানো হত হুগলী নদীর দৃশ্য ও নগরীর সৌন্দর্য্য।

হজরত মহল—

ইউ,পি,তে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল দুটি- ইংরেজগন কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার এবং মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহকে দিল্লীতে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদ হতে অপসারণের প্রস্তাব। এর ফলে মুসলমানগন হয়েছিলেন মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ। অযোধ্যায় গণবিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ এক ও অভিন্ন বৃটিশবিরোধী মনোভাবপ্রসূত। পূর্বেই বলেছি নবাব পরিবার ছিল অযোধ্যায় সকল বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু। ওয়াজেদের কলকাতায় অন্তরীনকালে বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন বীরাঙ্গনা **বেগম হজরত** মহল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ বেদনার বহ্নি বিস্ফোরিত হল বিদ্রোহে। দুগ্ধ পোষ্য শিশু বিরজিস কাদরকে শূন্যসিংহাসনে শুইয়ে দিয়ে ওয়াজেদের নিষ্কাষিত তরবারী নিজহস্তে ধারণ করে বেগম হজরত মহল সৈন্যদের যুদ্ধের নির্দ্দেশ। জুনমাসে সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ-এ রেসিডেন্সী অবরোধ করল। তখন বৃটিশ রেসিডেন্টে ছিলেন হেনরী লরেন্স। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে প্রাণ হারাতে হল। হ্যাভ্‌লক্ অবরোধ ভঙ্গ করতে না পারায় এলেন জেম্‌স আউটরাম। শেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চে এলেন ইংরেজদের প্রধান সেনানায়ক ক্যাম্‌বেল যিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন এবং বিদ্রোহীদের নেপালে বিতাড়িত করলেন। দীর্ঘ দশমাস কাল সংগ্রামের পর বীরাঙ্গনা বেগম শিশুপুত্র বিরজিস কাদরকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন নেপালে।

দগ্ধ-নগরী—

রাজ্যচ্যুতির নির্মম আঘাত ও বন্দীশালার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে ওয়াজেদ হয়ে পড়লেন অসুস্থ। স্বয়ং ইংলণ্ডে গিয়ে পুনরায় নালিশ করা তাঁর সম্ভব হলনা। তাঁর প্রতি যে অন্যায়, অবিচার ও নিপীড়ন করা হয়েছে তা রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট বর্ণনা করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন ইংলণ্ডে। উক্তদলে ছিলেন তাঁর জননী - রাণী কিশ্‌ওর, জ্ঞাতিভ্রাতা মির্জা সিকন্দর হাশমৎ, পুত্র কেঁওয়া কাঁদর ও মির্জা

মোহাম্মদ আলী বাহাদুর। ওদিকে অযোধ্যায় বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে এবং লক্ষ্ণৌ-এ নবাবের সুরম্য অট্টালিকা, দিলকুশামহল, মোতিমহলের নিকট মির্জার বাড়ী, ইমামবাড়ীর চতুর্দ্দিকস্থ সকল উচ্চ অট্টালিকা এবং মির্জা হোসেন খাঁনের ইমামবাড়ী ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। বাদশাহ বাগ ও অন্যান্য বস্তু করা হয়েছে নিলাম। তোষাখানার পশুগুলিও পর্য্যন্ত ইংরেজের নির্মম গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। প্রাসাদপ্রহরী হয়েছে ইংলিশ বুলেটের বলী। হজরত আব্বাসের দরগায় কয়েকশত শরণার্থী নারীর উপর নির্য্যাতন, পীড়ন ও ধর্ষন। পনের দিন ধরে লক্ষ্ণৌ-এ চলল লুঠতরাজ। ইতস্তত: প্রক্ষিপ্ত নবাব বাড়ীগুলিতে অগ্নিসংযোগ ও নবাবের গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন। রাজধানীতে বিষাদের করালছায়া। তাঁর সাধের কায়সার বাগ যা তালুকদারদের মধ্যে পরে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল ও সমস্ত দগ্ধ নগরী নবাবের বিরহব্যথায় কাতর ও শোকসন্তপ্ত। সুপ্রসিদ্ধ উর্দূকবি জোশমলিহআবাদীর ভাষাতেই শুনুন :—

"তুমনে কায়সার বাগকো (তুমি সিজারের বাগিচা' তো
দেখাতো হোগা বারহা দেখেই থাকবে বিলক্ষণ
আজভি আতি হায় জিস্‌সে আজও যেথায় রব শুনা যায়
"হায় আখতার কি সদা।" "হায় আখতার অনুক্ষণ।

মেটিয়াব্রুজ—

দীর্ঘকাল পর ইংরেজ সরকার যখন দেখলেন নিরুপায় নবাব হতে কোনরূপ বিপদ ও আশঙ্কার কারণ আর নেই তখন তাঁকে পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে সম্মানীয় নাগরিকের মত বসবাস করার নির্দ্দেশ দিলেন কিন্তু তেজস্বী ওয়াজেদ দৃপ্তকণ্ঠে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সরকারকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন যে শাসক হিসাবে যদি তাঁকে তথায় ফিরতে দেওয়া হয় তবেই ফিরবেন নতুবা অযোধ্যায় আর পদার্পণ করবেন না। কিন্তু সরকার নিজনির্দেশে অটল থাকায় ওয়াজেদ শেষে কলকাতার উপকণ্ঠে কোন নিভৃত, নিরুপদ্রব ও শান্তপরিবেশে, প্রকৃতির ক্রোড়ে বসবাসের বাসনা প্রকাশ করে সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে ইংরেজ সরকার তাঁকে দেখালেন বর্ত্তমান মেটিয়াব্রুজ নামক স্থানটী। তখনকার মেটিয়াব্রুজ ছিল তাঁর কবিমানসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ও উপযোগী। তাই তিনি এই স্থানটীই পছন্দ করলেন। কিন্তু স্থায়িভাবে বসবাস করতে হলে বাড়ীর প্রয়োজন। ইংরেজ সরকার তাঁকে মাসিক এক লক্ষ টাকার বৃত্তি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তখনও ছিল কেবল কাগজে কলমে। বহু অভিযোগ করার পর পরবর্ত্তীকালে তার কিয়দংশ আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অযোধ্যায় তাঁর যে প্রচুর

মুদিয়ালী লাইব্রেরী

ধন-রত্ন, অর্থসম্পদ ছিল তা ইংরেজ সরকার পূর্ব্বেই হস্তগত করেছিলেন। বর্তমান ভূতঘাট নামক স্থানে নদীর তীর বরাবর কতগুলি ছিল মাটীর ঘর তখন। ওয়াজেদ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মুচিখোলার ঐ মাটীর ঘরগুলির দু'একটিতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মত প্রায় সাত-আট মাস কাল অবস্থান করেন।

মেটিয়াব্রুজে তখন বাড়ীঘর বলতে তেমন কিছু ছিল না। কেবল কয়েকটী মাটীর মন্দির আর কতকগুলি সুউচ্চ মাটীর স্তূপ। উক্ত স্তূপগুলির উপর হতে চতুর্দিকে বহুদূর অবধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল এবং শত্রুসৈন্যের যাতায়াত ও গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য স্তূপগুলির গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। সংক্ষেপে আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ও দেশের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য এই স্থানটী ছিল পর্যবেক্ষন কেন্দ্র বা Observatory বিশেষ। উক্ত কারণেই এর নামকরণ হয় মেটিয়াব্রুজ। কলকাতা নগরী হতে মেটিয়াব্রুজ যাতায়াতের একটি মাত্র কাঁচা পথ ছিল এবং কাঁচা পথ হতেই "কচ্চি সড়ক্" নামটী এখনও বেশ প্রচলিত। ওয়াজেদের আমগনের পূর্বে মেটিয়াব্রুজে ছিল কয়েকটী বিরাট বাগিচা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বর্তমান মেটিয়াব্রুজ থানার নিকট হতে মেটিয়াব্রুজ উচ্চবিদ্যালয় পর্য্যন্ত নদীর তীর বরাবর ছিল তখন বিরাট এক আম বাগিচা। তাছাড়া বর্তমান গার্ডেনরীচ পৌরসভার পূর্বদিকে প্রাচীর বেষ্টিত নবাবের যে কবরখানা যেখান হতে প্রতিবৎসর মহরমের শোভাযাত্রা বের হয় তাও ছিল এককালে আম বাগিচা। শেষোক্ত বাগিচা হতে শোভাযাত্রা ইমামবাড়ী হয়ে প্রথমোক্ত আম-বাগিচায় পৌছাত। বর্তমান পাওয়ার হাউসের দক্ষিণে ছিল নবাবের "আতাবাগ"। এ ছাড়া আসাদবাগেরও নাম শুনা যায়। পাওয়ার হাউসের পূর্বে গঙ্গাতীর বরাবর নয় নম্বর ডক্‌পর্য্যন্ত ছিল নবাবের ফুলবাগিচা। উক্ত বাগিচা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বেগমদের আনাগোনায় হয়ে উঠত মুখর। এটাই ছিল তখন বেগম বিহারী বাগিচা। নগরী হতে এসকল বাগিচার পৌছানর একটী মাত্র প্রধান পথ ছিল ইংরেজগণ যার নাম করণ করেছেন "গার্ডেনরীচ রোড।" উক্ত পথটি সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি অভিমত এই যে Reach শব্দের আর এক অর্থ হল—"দুইটি বাঁকের মধ্যবর্ত্তী নদীর সরল অংশ" বিশেষ (Strait portion a stream between bends)। উক্ত কারণেই পথটির ঐরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী Reach এর উপরি-উক্ত অর্থ গ্রহণ করলে পথের নামটির মধ্যে 'গার্ডেন' শব্দটি নিরর্থক বা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

রাজ বাড়ী

বিষয়ান্তরে অযথা আর কালক্ষেপ না করে এবার মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করি। ওয়াজেদ মুচিখোলায় অবস্থান কালে অর্থাভাবে পড়েন এবং স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য বাড়ী

নির্মাণের অভিপ্রায়ে সরকারের নিকট অভিযোগ করেন এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত তাঁর ধনৈশ্বর্য্যের কিয়দংশ ফেরত পাওয়ার দাবী জানান। ফলে ইংরেজ সরকার নবাবের অধিকৃত সম্পদের সুদস্বরূপ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। পরবর্তীকালে উক্ত টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং উক্ত অর্থসাহায্য রাজনৈতিক বৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করে। উক্ত অর্থ দ্বারাই তিনি জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ এবং মেটিয়াব্রুজে বাড়ী নির্মাণ করেন। বর্তমান কমলটকী হতে আয়রণ গেট রোড অবধি গঙ্গাতীর বারবর স্থানটি ছিল 'সুলতানখানা' বা রাজবাড়ী নামে পরিচিত। নবাবের বাড়ী ছিল বর্তমান ভিক্টরী জুট মিল্‌স যেখানে অবস্থিত। বাড়ীগুলির চারিদিকে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগিচা ও কুঞ্জ। এর মধ্যে ছিল আসাদ মঞ্জিল, রাধা মঞ্জিল, সারধা মঞ্জিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সব কিছুই এখন অবলুপ্ত। কেবল টিকে আছে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ যেখানে ওয়াজেদ প্রত্যহ উপাসনা করতেন। গঙ্গাতীরে শামসিয়া জেনানা মাদ্রাসার পূর্ব্বে ছিল তাঁর পশুশালা এবং বাঙ্গালী বাজারের পূর্ব্বে মজে যাওয়া পুষ্করিণীটি ছিল এককালে নবাবের "পদ্মপুকুর" যেখানে বিচিত্রবর্ণের প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে দেখা যেত মরাল-মরালীর ক্রীড়া নৈপুণ্য। একদা ম্যাচফ্যাক্টরীর অধিকারভুক্ত, অতীতের নীরব সাক্ষী স্বরূপ গঙ্গাতীরে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজবাড়ীর এক বিভিন্ন অঙ্গ — তাঁর ক্ষয়িষ্ণু খওয়াবগাহ বা স্বপ্নাবাস (dreamiry)।

নবাব ওয়াজেদ—

ওয়াজেদ ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ। সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। কেশ ও বেশ বিন্যাসও ছিল তাঁর শিল্পী মনের পরিচায়ক। তাছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল কতকগুলি অপরূপগুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়। বিভিন্ন বিষয়ে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। আরবী ও পার্শী সাহিত্যে ছিল বিশেষ ব্যুৎপত্তি। এদিক দিয়ে সম্রাট আকবরের সভারত্ন আবুল ফজলের পরেই তাঁর স্থান। কেবল কবি ও নাট্যকারই (ইন্দ্রসভা?) তিনি ছিলেন না ; ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত ও নৃত্যেও ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ও নৈপুন্য। তানসেনের বংশধর সঙ্গীতজ্ঞ পিয়ারে খাঁ, জাফর খাঁ, হায়দার খাঁ ও বাসিৎ খাঁ লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। মেটিয়াব্রুজে তাঁর সঙ্গীত সভায় ছিলেন গায়ক ঘুন্নি খাঁ ও সঙ্গীতজ্ঞ নেমাতুল্লা খাঁ। মাতৃভাষা ছিল তাঁর লক্ষ্ণৌ-এর শুদ্ধ ও মার্জিত উর্দূ। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক ৪৬ খানি পুস্তক তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁর কবিতাবলী "গুলদস্তা আশেকাঁ" ও "দিওয়ানে আখতার" সবিশেষে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। ফোর্ট উইলিয়মে অন্তরীণ থাকাকালে দেড় সহস্র কবিতা বিশিষ্ট বিখ্যাত "মসনবী হাজনে আখ্‌তার" রচনা করেন। এতে আছে তাঁর জীবনস্মৃতি তাঁর প্রতি ইংরেজদের আচরণ ও সভাসদের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাস ঘাতকতার কাহিনী। আরবী, পার্শী ও উর্দূ কবিদের

অনুসরণে ও অনুকরণে প্রতি কবিতার শেষে এই শিল্পী কবি তাঁর কলমী-নাম (Per name) "আখতার" ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবি-মানসের প্রকৃত পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতাংশের সামান্য উদ্ধৃতি বুঝি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখনকার অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কবিতায় তিনি তাঁর সভাসদদের সম্বোধন করে বলেছেন :—

আন্দোহ আলমকা দিলপে ঘেরা হোগা,
আয় বাজম, অজিব হাল তেরা হোগা,
শমা কায়সি, বুঝ জায়েঙ্গী ঘর ঘর কে চেরাগ
ছুপ্ জায়েঙ্গে "আখতার" তো অন্ধেরা হোগা।
(দুর্ভাবনার জগৎ-ভার হৃদয় ঘিরে রবেই রবে,
হায়, সভাসদ ! তোমাদেরও আজব হাল তো হবেই হবে।
ঝাড়বাতি কি ! নিভবে দেখা ঘরে ঘরে দীপের বাতি।
ডুব্‌লে যদি "আখ্‌তারই" তো জগৎভরা আঁধার রাতি।)

ওয়াজেদের রাজসভায় ছিল পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুনীজনের যথেষ্ট সমাদর। লক্ষ্ণৌ-এ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া, মেটিয়াব্রুজে কয়েকটি মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত তাঁর তত্বাবধানে। এ সব প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে উর্দু ছাড়া, ছিল বিশেষরূপে আরবী ও পার্শী সাহিত্যের প্রাধান্য। সঙ্গীত ও নৃত্যবিশারদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি কম ছিলনা। কতগুলি গৎ ছিল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেগুলিকে তিনি অভিনব নামে অভিহিত করেন। মেটিয়াব্রুজে রাজবাড়ীতে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল তাঁর সঙ্গীত ও নৃত্যশালা। এর মসৃণ দেওয়ালগুলির উপর ছিল এক অভিনব দুলর্ভ পালিশ এবং তার উপর ছিল নানা রাগ-রাগিনীর চিত্রাদির বৈচিত্র্য। বহু শিল্পীর উপস্থিতিতে চলত নৃত্যসঙ্গীতের নিয়মিত অনুশীলন। স্মরণ রাখতে হবে—মেটিয়াব্রুজে ওয়াজেদ ছিলেন আন্তরীণ ! তাঁর জীবনযাত্রা ছিল কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জনগণ হতে তাঁকে বিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল ইংরেজদের নীতি। যাতে তাঁর সঙ্গে কোনরূপ জনসংযোগ না ঘটে সেদিকে ছিল ইংরেজদের সতর্কদৃষ্টি। এ কারণে মেটিয়াব্রুজে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। এমন কি ধর্মীয় কোন বৃহত্তর জনসভায় তাঁর যোগদান ছিল নিষিদ্ধ এবং খিদিরপুরের সেতু অতিক্রম করে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তাঁকে তৎকালীন গভর্ণরের বিশেষ অনুমতি নিতে হত।

কোন কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক তাঁর উপর যে অপবাদ আরোপিত করেছে, বাস্তবের স্বীকৃতির চেয়ে তা অতিরঞ্জিত বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এ ধরণের প্রচারকার্য্য ও প্রপাগণ্ডায় ছিল ইংরেজদের কুটীল হস্ত। কেননা তাঁদের নীতি ছিল—পৃথিবীর চক্ষে ওয়াজেদকে হেয় ও অপরাধী প্রতিপন্ন করতে পারলে তাঁদের পীড়ন ও নির্য্যাতনে ওয়াজেদের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর

মুদিয়ালী লাইব্রেরী

শ্রুতিগোচর হবে না। উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হয়েছে। এ কারনেই 'ওয়াজেদে' কেবল কামাসক্ত ও ভোগবিলাসী রাজা হিসাবেই পরিচিত কিন্তু তাঁর ব্যাক্তিত্বের কোন উজ্জ্বল দিক জনগনের সম্মুখে নেই। অশেষগুণের অধিকারী হলেও ওয়াজেদকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও অপরাধমুক্ত বলা যায় না। ত্রুটী-বিচ্যুতি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ওয়াজেদও ছিলেন মানুষ ; নিশ্চয় দেবদূত নন এবং এমন মানুষ যাঁর নিকট ছিল ভোগবিলাস ও সুখ-সম্ভোগের যাবতীয় উপকরণ। কাজেই আবেগ ও অনুরাগের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তাঁর লখনবী পাঞ্জাবী প্রান্ত সিক্ত হবে—তাতে বিচিত্র কি ! তাঁর গুণাবলীর আধিক্যই শাসক হিসাবে অপরাধের কারণ হয়েছিল জনগনের নিকট। তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ কবি, শিল্পী ও লেখক এবং গৌণতঃ শাসক, কারণ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রেসিডেন্টই ছিলেন প্রকৃত শাসক। আবেগ, অনুভূতি ও কোমল হৃদয়বৃত্তির আধিক্যই ছিল বজ্রকঠিন দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক। জীবনের অধিকাংশ কালই কেটেছে সাহিত্য সাধনায়, গ্রন্থনায় ও সঙ্গীতকাব্য চর্চায়। অবশ্য কিয়দংশকাল যে কাটতো বিলাস বাসনে, কুসুম শয্যায় ও কামিনীকেশদামে তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁর চরিত্রে ছিল শিশু-সুলভ সরলতা সহিষ্ণুতা ও বিনয়। সততা ও শঠতার দ্বন্দ্বে প্রথমোক্তের হয়েছিল সাময়িক পরাজয়। কোন সভাসদ বা ভৃত্য অপরাধ করলে শাস্তি প্রয়োগের পরিবর্তে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে তার সংশোধন করাই ছিল তাঁর স্বভাব। কারও প্রতি সন্দিহান হওয়া ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ এবং মন্ত্রীর উপর অতি নির্ভরশীলতার জন্য পরবর্ত্তীকালে তাঁকে উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছিল।

প্রজা ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কে

লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর জনপ্রিয়তা কম ছিল না। সমসাময়িক দিল্লীতে যখন অশান্তি, উপদ্রব ও উগ্রতা বিরাজ করত, লক্ষ্ণৌ-এ তখন ছিল শান্তি ও নিরুপদ্রবতা। লক্ষ্ণৌ-এ অধিকাংশ প্রজাই সুন্নী মুসলিম কিন্তু ওয়াজেদ ছিলেন শিয়ামতাবলম্বী। তথাপি শাসক ও শাসিতের মধ্যে কখনও কোনরূপ সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব ঘটেনি যদিও ঐরূপ ঘটনার চেষ্টা করা হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ-এ ওয়াজেদ সুন্নীদের নিকট যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, দিল্লীতে বাহাদুর শাহ জাফর স্বয়ং সুন্নী হয়েও দিল্লীর সুন্নী মুসলিমদের নিকট ততখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। রাজপথ দিয়ে যাত্রাকালে তাঁর অগ্রে থাকতো দুটি বিরাট সিন্দুক যাতে প্রজাগণ নিজ নিজ অভিযোগ নিক্ষেপ করতেন এবং সম্রাট স্বয়ং অভিযোগগুলির তদন্ত ও সুবিচার করতেন। সকল প্রজাই -- হিন্দু, মুসলিম জমিদার, আমির ওমরাহ ছিলেন সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। "অযোধ্যারাজের যদিও নৃত্য ও সঙ্গীতে প্রবল প্রবণতা, তথাপি কখনও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রজার উপর তার পক্ষ হতে নির্য্যাতন ও নিপীড়ন হয়নি। অযোধ্যার

মুদিয়ালী লাইব্রেরী

হস্তচ্যুতির জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক ও উদাসীন মন্ত্রী "আলী নকী" (কোহিনূর পত্রিকা, লাহোর, ১৮ই এপ্রিল, ১৮৫৬ খৃঃ)।

সিংহাসনে আরোহণের পরেই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন সৈন্যবিভাগের পুনর্গঠনে। সৈনিকদিগকে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা ড্রিল বা প্যারেড করতে হত। তিনি স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ও তপ্ত রৌদ্রে তা পর্য্যবেক্ষণ করতেন। উপস্থিতির শৈথিল্যের জন্য তাদের জরিমানা করা হত এবং সমস্ত দিবস সজ্জিত অবস্থায় রৌদ্রে দণ্ডায়মান থাকতে হত। তাঁর এরূপ সচেতনতায় ইংরেজদের হল সন্দেহ। সৈন্যবিভাগের প্রশিক্ষণ, পুনর্গঠন ও সামরিক কূচকাওয়াজ সম্পর্কে তাঁর এত আগ্রহ কষ্ট স্বীকারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজ রেসিডেন্ট। রেসিডেন্ট সাহেব এও বললেন যে দেশরক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সৈন্য তাঁকে সাহায্য করবে এবং তার ব্যয়ভার বহন করা হবে অযোধ্যার রাজকোষ হতে। দরবারের আমীর ওমরাগণও তাঁকে এই মর্মে পরামর্শ দিলেন যে বিজাতীর মনে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী নকী খাঁও বললেন যে রেসিডেন্ট মহাশয় সামরিক কূচকাওয়াজের বিরোধী। অগত্যা এ সব ত্যাগ করার পর দেখা দিল রাজকার্য্যে তাঁর উদাসীনতা এবং সুখ-সম্ভোগে আসক্তি। নতুবা বহু পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ ইংরেজগণ তাঁদের পথের উক্ত কণ্টকটি দূর করে দিতেন কারণ তার কোন আত্মসচেতন হুকুমবরদার বরদাস্ত করতে পারতেন না।

ওয়াজেদ ছিলেন শান্তিপ্রিয়; যুদ্ধ অপেক্ষা আলাপ আলোচনা দ্বারা সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতী। অবশ্য তার কারণও ছিল। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল। মন্ত্রী নকী খাঁর ইংরেজ প্রীতি ও নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। রেসিডেন্ট আউটরাম দরবারে প্রবেশকালে সান্ত্রীদের অস্ত্রহীনতা, তোষাখানার তোপ উধাও। তাঁর আনীত গভর্ণরের নির্দ্দেশে প্রজা, রাজ কর্মচারী, তালুকদার, জায়গীরদার ও জমিদারদের মস্তক অবনত। রাজা বালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তালুকদারদের সৈন্যসহ নিজ নিজ তালুকে প্রত্যাবর্তনের নির্দ্দেশ। ছল চাতুরী ও প্রবঞ্চনা দ্বারা ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক লাহোর পরিবেষ্টিত এবং শহরের মধ্যে তাঁদের দুইটী শিবির স্থাপন। শাসন ব্যাপারে ওয়াজেদের ঔদাসিন্য ও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে ইংরেজদের প্রচারকার্য্যের ফলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা, তাছাড়া তুল্‌সীপুরের রাজা কর্ত্তৃক নিজ পিতাকে বন্দী দশ সহস্র সশস্ত্র সৈন্য সহ ওয়াজেদের বিরুদ্ধাচরণ। প্রজাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এই ভেবে প্রথমে তিনি যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করলেও পরিশেষে তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের পরামর্শে সম্মত হয়েছিলেন। প্রজাগণ ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের পর ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রশাসন ও সেনা বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পদচ্যুত করে তাঁদের অনুগত ব্যক্তিদের উক্তপদে নিযুক্ত

মুদিয়ালী লাইব্রেরী

করার এবং পূর্ব্বের তুলনায় অধিক করভার বৃদ্ধি করায় দেশবাসীর সম্বিৎ আসলো ফিরে এবং ওয়াজেদ লাভ করলেন তাঁদের হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

মেটিয়াব্রুজে রাজবাড়ীতে তদানীন্তন সরকারী পুলিশের কোন প্রকারেই প্রবেশ করার রীতি ছিল না। রাজদ্রোহী বলে আখ্যাত জনৈক ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে (ইংরেজ) সরকারী পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসলে সে আশ্রয় নেয় ওয়াজেদের কুঠিতে। তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন জনৈক বিচারপতি মন্তব্য করেন ঃ—

"মেটিয়াব্রুজে ওয়াজেদ আলীর কুঠি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নির্মিত দুর্গ বিশেষ যে কারণে সরকারী নির্দেশ পালন এবং সুবিচার কোনটিই সম্ভব নয়।"

দশ বৎসর রাজত্বের প্রথমাংশে ইংরেজদের সঙ্গে ওয়াজেদের সম্পর্ক মধুর না হলেও তিক্ত ছিলনা। তাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁদের অর্থসাহায্যও করেছেন। রেসিডেন্টের নির্দ্দেশও অমান্য করেননি। তাঁর সিংহাসন আরোহণের প্রথম বৎসরেই গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোর পরিদর্শনে গিয়ে ওয়াজেদের আতিথ্য স্বীকার করেন এবং সাদর অভ্যর্থনায় প্রীতি হয়ে উল্লেখ করেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে ওয়াজেদের পূর্বপুরুষের সদ্ব্যবহার ও সম্পর্কের কথা। পূর্বপুরুষদের ন্যায় ওয়াজেদও চেয়েছিলেন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ না ঘটে। কিন্তু আউটরাম রেসিডেন্ট হয়ে এলে শাসন ব্যাপারে ইংরেজ হস্তক্ষেপ চরমে ওঠে ও ওয়াজেদের সঙ্গে তাঁর তীব্র মত বিরোধ বৈরীতায় পরিণত হয়। ক্রমেই এগিয়ে এলো ওয়াজেদের ভাগ্যবিড়ম্বনার দিনগুলি। গৃহ ও বহিঃশত্রু দ্বারা ওয়াজেদ যখন পরিবেষ্টিত তখন ডালহৌসীর প্রেমপত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন রেসিডেন্ট। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কোম্পানীকে অযোধ্যারাজ্য দান করছেন এই মর্মে লিখিত এক চুক্তিপত্রে সই করার জন্য ওয়াজেদকে রেসিডেন্টের পীড়াপীড়ি। তাতে সই না করলে পরদিনই ঘোষণা করা হবে যে অযোধ্যা বৃটিশরাজ্যভুক্ত হয়ে গেছে এই মর্মে ওয়াজেদকে হুঁশিয়ারী কিন্তু ওয়াজেদ নিরুপায়; ক্রোধে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর ইংল্যাণ্ড যাত্রার পথেও প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হল। তাঁর ইচ্ছে ছিল মন্ত্রী নকী খাঁ ও রাজা বালকৃষ্ণকে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সহ সঙ্গে নেওয়া। কিন্তু আউটরাম কোতয়ালকে কড়া নির্দেশ দিলেন যে নকী খাঁ ও বালকৃষ্ণ যেন লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে যেতে না পায় এবং রাজ্যের দলিল দস্তাবেজ যেন ওয়াজেদের হস্তগত না হয়। ছাব্বিশ মাস ফোর্ট উইলিয়ামে অন্তরীণ থাকা কালে সাহেব সাহচর্য্যে লব্ধ-অভিজ্ঞতা ও অযোধ্যায় ইংরেজদের ছল, চাতুরী ও প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ তাঁকে করে তুলেছিল বাস্তববাদী। ফলে তাঁর মধ্যে জন্মেছিল ইংরেজপ্রীতি নয় বরং ঘৃণা। যাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের ফল এত ভীষণ, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

আরও ভয়ঙ্কর। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও একবার এলেন মেটিয়াব্রুজে ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পরদিন স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিষ্টাচার রক্ষায় ওয়াজেদ গেলেন গবর্ণর হাউসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ওয়াজেদ যে আসনে ছিলেন উপবিষ্ট ঠিক তারই সম্মুখে বিপরীত দিকে আর একখানি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন সাহেব মেও। উভয়ের কথোপকথনের মধ্যেই হঠাৎ কোন ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় মেও নিজ আসন ত্যাগ করে এবং ওয়াজেদকে তাঁর যথাস্থানে উপবিষ্ট অবস্থায় পরিত্যাগ করে উপরে উন্নত প্লাটফরমে রক্ষিত সভাপতির আসনে গিয়ে বসলেন। মেওর এরূপ আচরণ ওয়াজেদের নিকট অশোভন প্রতিভাত হল এবং তিনি অপমানিত বোধ করলেন। তৎক্ষনাৎ ওয়াজেদও নিজ আসন ছেড়ে সকল সৌজন্য ও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে বিদায় না নিয়েই ঐ গৃহ ত্যাগ করলেন। তারপর আর কখনও কোন ইংরেজের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। এই ঘটনার তিন বৎসর পর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স যিনি পরে সপ্তম এডওয়ার্ড নামে হয়েছিলেন খ্যাত, ভারতে এলে কলকাতায় এক বিরাট দরবারের আয়োজন হয়। এই দরবারে যোগদান কল্পে দূরদূরান্ত হতে বহু দেশীয় রাজা, আমীর, ওমরাহ প্রভাব-প্রতিশালী ব্যক্তিগণও এসেছিলেন। মন্ত্রী আমীর আলী খাঁ ওয়াজেদকেও উক্ত দরবারে উপস্থিত করার জন্য বহু চেষ্টা ও কৌশল করেছিলেন কিন্তু ওয়াজেদ তথায় যাওয়ার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইমামবাড়ী—

এবার ইমামবাড়ী প্রসঙ্গ। কুঠি নির্মানের পর ওয়াজেদের অযোধ্যা হতে পরিবার—প্রিয়জনদের মেটিয়াব্রুজে নিয়ে আসার অনুমতি লাভ করলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন বিভিন্ন বিষয় ও বিজ্ঞানে পারদর্শীব্যক্তিগণ, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, হাকিম বা ভেষজচিকিৎসক, ব্যবস্থাশাস্ত্রে (Theology) সুপণ্ডিত, ধর্মীয় প্রধান ও মুফতিগণ। দেখা দিল ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা। ওয়াজেদ স্বয়ং ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং বেগমগণও ধর্মপ্রাণা। তাঁদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনা ও শ্রেষ্ঠ উৎসব মহরম উদ্‌যাপনের দেখা দিল প্রয়োজনীয়তা। জনৈকা বেগম ওয়াজেদকে একটি ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করলে তিনি তাতে সম্মতি দিলেন। ফলে প্রতিষ্ঠীত হল শাহী ইমামবাড়ী। নামকরণ হল "সিব্‌তেন আবাদ ইমামবাড়ী।" এরূপ নামকরণেরও একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। "সিব্‌ৎ" শব্দটি আরবী। অর্থ হল "সন্তান"। আরবী বহুবচনে হয় "সিব্‌তেন" অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিগণ। "সিব্‌তেন আবাদের অর্থ হল—সন্তান-সন্ততিগণের পুনর্বাসন।" সুতরাং মেটিয়াব্রুজে নবাব ওয়াজেদের সন্তান-সন্ততিগণের পুনর্বাসন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইমামবাড়ীর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

অগ্রসর হই ইমামবাড়ী পরিদর্শন। বিঘে দুই পরিমান জমির উপর বাড়ীটি। এরই

ঠিক উত্তরে বর্তমান গার্ডেনরীচ ওয়ার্কস্‌শপের প্রাচীরের মধ্যে ছিল ওয়াজেদের পুত্র মির্জা ওলিআহাদ বাহাদুরের বাড়ী যার বর্তমানে কোন নিদর্শনই নেই। ইমামবাড়ীর তোরণদ্বারে ইংরেজীতে পিতলের বর্ণে ঐ যে লেখা রয়েছে SIBTAIN ABAD IMAMBARA। মস্তকের উপর খিলানশীর্ষে শ্বেতমর্মরে লিখিত রয়েছে একটি কবিতাংশ যা কালক্রমে হয়ে গেছে অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য। প্রবেশ করি সোজাসুজি ভিতরে। পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে কতগুলি ঘর। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বাড়ীটির উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোনে দুটি ঘর যা তোরণদ্বারের শীর্ষের সঙ্গে রচনা করেছে একটি ত্রিভুজ। শ্বেত মর্মরে প্রস্তুত বারান্দা অতিক্রম করে অগ্রসর হই দক্ষিণে। দেওয়ালের উপর কৃষ্ণ প্রস্তরফলকে খোদিত রয়েছে মন্ত্রী আমীর আলী খাঁন বাহাদুরের রচিত একটি দীর্ঘ পার্শী কবিতা। কবিতাটির শেষ দুটি ছত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ইমামবাড়ীর প্রতিষ্ঠাকাল। ছত্র দু'টী হল :—

সরো শম্‌ গুফ্‌ৎ তারিখে বনায়েশ্‌
বগো, "ঈশ্‌রৎ গহে সুলতান আলম।"

এতে প্রতিষ্ঠাকাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়নি। কবির অভিভাবক-দেবদূত প্রতিষ্ঠাকাল বললেন—বল, "জগৎসম্রাটের বিশ্রাম গৃহ"। দ্বিতীয় কমার মধ্যস্থিত অংশটী রীতিমত ধাঁ ধাঁ। এর থেকে সাল বার করতে হলে একটু অঙ্কশাস্ত্র জানার প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে পরিচিত হতে হবে আরবী বর্ণমালার নম্বরের (alphabetic Table) সঙ্গে। আরবী প্রতিটি বর্ণের স্থানবিশেষে এক একটি নম্বর হয় তাকে বলে আব্‌জদী নম্বর। এই আব্‌জদী হিসাব করলে আমরা পাই ১২৮৬ এবং এটাই ইমামবাড়ীর প্রতিষ্ঠাকাল হিজরী সনে। আনুমানিক ১৮৬৬ খৃঃ।

প্রবেশ করি অন্দরে। মেঝে হতে উন্নত রক্তরাঙা মখমলে আবৃত বস্তুটি হল বেদী। মহরম উপলক্ষ্যে এই ইমামবাড়ীতে অনুষ্ঠিত মজলিসের দিনগুলিতে নবাব ওয়াজেদ ঠিক বেলা দশটায় উপস্থিত হতেন এই বেদীর উপর। এখানেই আবৃত্তি করতেন তাঁর স্বরচিত 'সালাম' ও 'মার্‌সিয়া' (শোক গাথা) যা তিনি রচনা করতেন 'সুলতানখানা' হতে ইমামবাড়ী আসার পথে। সঙ্গে থাকতেন দু'জন মুন্সী। একজন লিখতেন 'সালাম' ও অপরজন লিখতেন 'মার্‌সিয়া'। ওয়াজেদ এত দ্রুত বলতেন যে একজন মুন্সীর লেখার কালে অপরজন অবসর পেতেন না। লক্ষ্ণৌ-এর অনুরূপ মেটিয়াব্রুজে তখন গড়ে উঠেছিল একটি মার্জিত বুদ্ধিজীবি সমাজ। ওয়াজেদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত থাকতেন তখনকার মেটিয়াব্রুজের নামকরা উর্দু কবিগণ খাজা কালাক, মুনশী আসির, মুনশী হুনর, নিস্তর, শারফ্‌ ও রাশ্‌ক। লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত কবি মশিরও এখানে আগমন করেন ও দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। উক্ত মজলিস-

গুলি সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে শেষ হত। সাধারণতঃ মহরমের তিন, দশ, বিশ ও চল্লিশের মজলিশগুলি হত আড়ম্বরপূর্ণ। পরবর্ত্তীকালে যে সব ইমামবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয় সে সবের শোভাযাত্রার পূর্ব্বে থাকতো এই শাহী ইমামবাড়ীর শোভাযাত্রা এবং মহরমের দশম দিনে ভোরে তাজিয়া, জরিহ ও গংরাদি (Paper towers) নিয়ে বর্তমান মেটিয়াব্রুজ উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকট আমবাগিচায়, গোলাম আব্বাসের কারবালায় হত বিসর্জন। কখনও কখনও নবাব ওয়াজেদ নগ্নপদে উক্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করতেন।

এবার অগ্রসর হই পূর্ব্বদিকে যেখানে ওয়াজেদের নীলাভ দেহাবশেষ চিরনিদ্রায় অভিভূত এবং পৃথিবীর সকলপ্রকার নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও প্রবঞ্চনা হতে চিরমুক্ত। সমাধির কাষ্ঠ-বেষ্টনীর উপর ঐ যে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে **His Majesty Wajed Ali Shah, King of Oudh**। শায়িতের শিয়রে উপবিষ্ট ও কোরাণ পাঠরত জনৈক ওয়াজেদ-প্রেমিক। সমাধির পাশেই রয়েছে সমাধিস্থের ঢাল ও তরবারি। পিতা ওয়াজেদের মৃত্যুতে পুত্র কবি "মজরুহ" যিনি বেগম জোহরা সাহেবার গর্ভজাত যে শোক গাথা আবৃত্তি করেছিলেন তা পাঠ করে দেখা যাক। ঐ যে সমাধির নিকটেই দেওয়ালে বিলম্বিত রয়েছে। মৃত্যু তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ খৃঃ। জনৈক খোঁড়া মুন্শী আলীকুলী বিষপ্রয়োগে তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে। এ ঘৃন্য অপকর্মের কারন ধনলিপ্সা এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র। লক্ষ্ণৌ-এ আজও কোন বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্ত 'আলীকুলী' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। "সজল-করুণ দৃষ্টি হাণি গৃহদ্বারে, বিদায় হে স্বদেশবাসী, যাই প্রবাসে।"

দর্ ও দিওয়ার পে হস্রৎ সে নেগাহ করতে হাঁয়,
রুখ্সৎ আর, আহ্লে ওতন, হাম তো সফর করতে হাঁয়।

(ওয়াজেদ)

ছাদ হতে বিলম্বিত মাথার উপর দোদুল্যমান বিচিত্রবর্ণের ঝাড়বাতির ঝলমল। হাজার বাতির যে বেলওয়ারী ঝড় একদা ওয়াজেদের দরবার কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত করত তা তাঁর লোকান্তরের পর প্রদর্শনার্থে এই ইমামবাড়ীতেই আনীত হয়েছিল কিন্তু এখন আর তার কোন হদীশ পাওয়া যায় না। স্বর্ণ-রৌপ্যের তাজিয়াগুলির অবস্থাও অনুরূপ। শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত মেঝের উপর কৃষ্ণ-প্রস্তরের রেখা-চিহ্নিত কতগুলি কবর। এরই মধ্যে একটিতে শায়িত রয়েছেন ওয়াজেদের পুত্র বিরজিস কাদর যাঁকে নিয়ে বেগম হজরত মহল আশ্রয় নিয়েছিলেন নেপালে। তথার বেগমের মৃত্যুর পর তরুণ বিরজিস ফিরে আসেন মেটিয়াব্রুজে পিতার নিকট কিন্তু পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ভাগ্যে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। জ্ঞাতি ভ্রাতার চক্রান্তে তাঁকেও অকালে পৃথিবী হতে নিতে হয়েচে বিদায়! এবার অগ্রসর হই পশ্চিমদিকে যেখানে বিশ্রাম-রত কুমার কেঁওয়া কাদর। এই যে তাঁর সমাধি। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ইনিই

প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টে অযোধ্যা প্রসঙ্গ হয়েছিল উত্থাপিত এবং উক্ত বিষয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড বিতর্ক। উক্তবিতর্কে Board of Control কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ডালহৌসীকে কি অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? না কি অযোধ্যার রাজা ও প্রজাগণ ইংরেজ রাজ্য-ভুক্তির বাসনা ও অভিলাষ প্রকাশ করেছিল? বলা হয়েছিল—অযোধ্যাকে তাঁদেরই (রাজা ও প্রজা) অধিকার অভিমতের উপর সমর্পণ করা বিচক্ষণ লর্ড ডালহৌসীর পক্ষে শোভন ও সমীচীন (কোহিনুর পত্রিকা, ২৭-৫-১৮৫৬ খৃঃ)।

এবার অগ্রসর হই আরও দক্ষিণে যেখানে দর্শনীয় তেমন কিছু না থাকলেও আছে একটি ক্ষুদ্র ফুলবাগিচা। অবশ্য ওয়াজেদের জীবদ্দশায় এর রূপ ছিল চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ। বিচিত্র রং রূপ ও গন্ধের অপূর্ব সমাবেশ। ফিরে যাই আবার বারান্দায়। পশ্চিমদিকে শ্বেতমর্মরের একটি জলাধার যেথায় বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির ক্ষুদ্র মাছের একদা ছিল অহরহ ক্রীড়া। নিকটেই রয়েছে আর একজন রাজপুত্রের সমাধি ও তারই পাশে বেগম নবাব খুরশিদ আরার সমাধি।

মহরম উৎসব উদযাপনে ও ইমামবাড়ীর কার্য্যধারায় ওয়াজেদ যে ট্রাডিশন স্থাপন করে গেছেন তা আজও চলেছে সমানে। তবে কালের গতিতে ও অর্থনৈতিক কারনে কমেছে কেবল জাঁকজমক ও আড়ম্বর। ওয়াজদের তিরোভাবের পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ প্রত্যেকে ইংরেজ সরকারের নিকট মাসিক বৃত্তি করতেন পাঁচশত টাকা। দেখা দিল ইমামবাড়ী পরিচালনা ও তার ব্যায়ভার সমস্যা। এ বিষয়ে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর কতকগুলি সুপারিশ করে গেছেন। স্বাধীন ভারত সরকার ঐ সকল সুপারিশের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি। প্রতিবৎসর মহরম উপলক্ষ্যে কিছু সরকারী সাহায্য লাভ করেন এর অছি পরিষদ (Board of Trustees) উক্ত পরিষদ দ্বারাই এই ইমামবাড়ী বর্তমানে পরিচালিত হয়। অযোধ্যা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত।

লখনবী প্রভাবঃ—

সুন্নীমুসলিম-প্রধান মেটিয়াব্রুজে অবস্থানকালেও ওয়াজেদ অর্জন করেছিলেন জনগণের সহানুভূতি। যদিও ধর্মীয় কোন কোন বিষয়ে ছিল সুন্নীদের সঙ্গে মতপার্থক্য, তথাপি তা কখনও উগ্রতায় পরিণত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, ওয়াজেদের বিলাসিতা, নৃত্যগীত প্রবনতা, আরাম ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং বিশেষরূপে তাঁর 'মতা' বা চুক্তিবদ্ধ বিবাহের (Contract marriage) আধিক্য সুন্নী মুসলিমগন সমর্থন করতে পারেননি, তৎসত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির অভাব ছিলনা। জীবনযাত্রার সর্বস্তরে তখন সংক্রামিত হয়েছিল লখনবী প্রথা, রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান, আদব-কায়দা ও সখ-সৌখীনতা। নিত্যপ্রয়োজনীর দ্রব্যাদি ব্যতীত

বেশভূষার বিন্যাসে, কুঠিগুলির সাজসজ্জায় ও সৌখীনতার চরিতার্থতায় দেখা দিল উপাচার ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা। গড়ে উঠল এসব সামগ্রীর কতগুলি ক্ষুদ্র সরবরাহকেন্দ্র। রমনীগণের দেহ সজ্জায় এলেন স্বর্ণ শিল্পী এবং ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে কুঠীগুলি, উদ্যান ও পথ আলোকিত করার জন্য কেউ নিলেন রেড়ীর তৈল সরবরাহের দায়িত্ব। লক্ষ্ণৌ হতে ওয়াজেদ পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন কয়েকজন হেকিম বা ভেষজচিকিৎসাবিদ। ফলে মেটিয়াব্রুজেও প্রচলিত হল আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের সহোদর হেকিমী বা ভেষজচিকিৎসা বিজ্ঞানের। স্থাপিত হল কয়েকটি 'আত্তারখানা' বা ভেষজদ্রব্য বিপনি। লখ্‌নবী পাজামা, পাঞ্জাবী, আঙ্গর্খা, আচ্‌কান্‌, মির্জাই, শিমলা (পাগড়ী), ঝুলা (টুপী), ও শলুকা প্রভৃতি প্রস্তুতির এবং এ সবের উপর বিচিত্র বুটি ও লতাপাতা ও ফুলের কারুকার্য্য বা কাশিদাকারির (embroidery) জন্য প্রয়োজন দেখা দিল সুদক্ষ কারিগরের। গড়ে উঠল সূচী শিল্প। পরবর্তীকালে ইংরেজ সৌখীন মহিলাদের গাউন (gown) প্রস্তুতির জন্য গড়ে উঠেছিল একদল গাউনশিল্পী। এরূপে গার্ডেনরীচ সূচী-শিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হল। ইমামবাড়ী ও মহরম কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছিল মহরমের বার্ষিক মেলাটির। সুদূর পল্লীতে প্রস্তুত কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির বার্ষিক বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে বৃদ্ধি পেল এই মেলাটির গুরুত্ব। সর্ব্বাধিক প্রভাবিত হল আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষায় দেখাদিল উর্দু শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য্য ও প্রবণতা। বহু উর্দু শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যর্থ হয়ে হল বিকৃত। "জহাঁপনাহ্‌" হতে "জাঁপনা"। উক্ত লখনবী আক্রমণ পোষাকপরিচ্ছদেই সীমাবদ্ধ থাকল না; প্রবেশ করল পাকশালে পাকপ্রণালীতেও। স্বর্ণ ও রৌপ্যপত্রে (gold and silver foils) অবগুণ্ঠিত লখনবী আহার্য্যের উপাচার নিজ আসন করে নিল 'দস্তরখানে'। 'শামী কবাব' হতে 'সেকজ্ঞবীন' অবধি চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সকল আয়োজন উদরস্থ করে, স্বর্ণ-মুক্তা ভস্মের একটি পান মুখে দিলে মন থাকতে চাইলো না আর মর্ত্যে; ছুটল মহাশূন্যে ঘুড়ির পানে। গড়ে উঠল ঘুড়ির ব্যবসা। ওয়াজেদের অশ্ব-যানের অনুকরণে স্থানীয় বিত্তবানদের মধ্যে দেখা দিল অনুরূপ অশ্বযান নির্মাণ ও আরোহণের প্রবণতা। সংক্ষেপে স্থানীয় কল্‌চরের উপর চলল লখ্‌নবী কল্‌চরের তীব্র আক্রমণ।

মেটিয়াব্রুজের ধ্বংস-সাধন

সর্ব্বশেষে একটি প্রশ্ন উদিত হয় আমাদের মনে। প্রায় চল্লিশ হাজার অধিবাসী ও বুদ্ধিজীবী সমাজ নিয়ে একদা যে মেটিয়াব্রুজ ছিল বাগিচা-কুঞ্জে ও সুরম্য কুঠিদ্বারা সুশোভিত এক স্বর্গপুরী, আজ তা নিশ্চিহ্ন ও অবলুপ্ত! কুঠিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য অস্বীকার করে মেটিয়াব্রুজের ধ্বংস-সাধন করেছিল বৃটিশ ভ্যাণ্ডালিজমের লীলা। লক্ষ্ণৌ-এ তাঁরা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, মেটিয়াব্রুজের রাজবাড়ী সম্পর্কেও সেই একই নীতি অনুসরণ

মুর্দিয়ালী লাইব্রেরী

করলেন। ওয়াজেদের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার শাহী কুঠিগুলি ও সেগুলির সকল মূল্যবান সাজসজ্জা ও আসবাব-আদির উপর নিযুক্ত করলেন কঠোর প্রহরা। পরে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে কুঠিগুলি শরিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। পূর্ব অবস্থায় কুঠিগুলি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে সম্ভবতঃ সেগুলি টিকে থাকতে পারত। কিন্তু ইংরেজ সরকার সমস্ত কুঠি, মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব-আদি বিক্রয় করে লব্ধ অর্থ ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াই সুবিচার মনে করলেন। ফলে কুঠিগুলি খুঁড়ে ফেলা হল। বাগিচা ও রমনা ধ্বংস হল। পশুশালার পশুগুলিও বিক্রীত হল। মোটের উপর ওয়াজেদের আমলের মেটিয়াব্রুজের কোন নিদর্শনই থাকল না। আজ সে কুঠিও নেই, নেই তার প্রতিষ্ঠাতা। আছে কেবল মুমূর্ষু ইমামবাড়ী। একদা জ্বলত যেথায় শমা, সেথায় রয়েছে এখন পতঙ্গের ভস্ম। কবি জোশকে পুনর্ব্বার স্মরণ করেই শেষ করি :

কিয়া অওধ্ কি বেগমোঁকা ভি সতানা ইয়াদ হায় ?
ইয়াদ হায় ঝাঁসি কি রাণী কা জামানা ইয়াদ হায় ?
ইয়াদ তো হোগী ও মটিয়াবুর্জ্ কি ভি দাস্তান
অব্ ভিজিস্‌কি খাক্‌সে উঠ্‌তা হায় রহ্ রহ্ কর ধুয়া।

অর্থাৎ—

মনে আছে অযোধ্যার বেগমদের নির্যাতন ?
মনে আছে ঝাঁসী রাঈর আমলটা কি মনে আছে ?
মনে আছেই মেটেবুরুজের সেই অঘটন
আজও যার ভস্ম হতে ধোঁয়া ওঠে মাঝে মাঝে !

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : —

১। শ্রী এম, এ, জাফর 'শমীম' (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)
২। ক) রঈস আহমেদ 'জাফরী' (নির্দেশিকা)
খ) আব্দুল হালিম 'শারর' (তৎকালীন উর্দু কবি)

পল্লব হইতে পুনর্মুদ্রিত